সংবাদ

তারিখ ... 02 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

প্রশ্ন ফাঁসের ফাঁদে শিক্ষা ব্যবস্থা

আলমগীর খান

পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এখন ডালভাত। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৬৩টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আর ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার সব প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়েছে। অনুসন্ধানকারীগণ দেখেছেন সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, কোচিং সেন্টার, নোট বই প্রকাশক এসব প্রতিটি মহলের কেউ না কেউ এ অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। দেখা যাচ্ছে, কারা এ অপরাধের সঙ্গে জড়িত সে তালিকার চেয়ে কারা যুক্ত নয় সেই তালিকা তৈরি সহজ হতো। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে কারা জড়িত নয় সে তালিকা দেয়া যে সম্ভব হয়নি, তার কারণ মনে হয় সে তালিকায় দেয়ার মতো কারও নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। বোঝাই যাচ্ছে, প্রশ্ন ফাঁসের শিকড় কত গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে।

আশ্চর্য হলো, যা নিয়ে সারাদেশের সচেতন মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, মনে হয় সরকার তা উপভোগ করছিলেন। কারণ শিক্ষামন্ত্রী ক্রমাগত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি সরকার তার আমলে পরীক্ষায় ভালো ফল করাকে একটা রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে প্রচার ও ব্যবহার করে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে বা থাকা উচিত। সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্ন ফাঁস ও ঢালাও নম্বর দিয়ে পাসের হারের উচ্চ বৃদ্ধি ভালো ফল করাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও হাস্যকর করে তুললো। এর মধ্যে ক'দিন আগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল আগের চেয়ে খারাপ হলো। এদেশে ভালো করলেও ছিদ্রান্বেষীর অভাব হয় না, খারাপ করলে তো কথাই নাই– শিক্ষামন্ত্রী এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। রসিকজনেরা খারাপ ফল হওয়ার একটা কারণ হিসেবে প্রশ্ন ফাঁস না হওয়াকে দায়ী করলেন। অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী খারাপ ফলের জন্য হরতাল-অবরোধ-ওয়ালাবিরোধী দলকে দায়ী করলেন। দুই পক্ষ দুই মেরুর হলেও তাদের চিহ্নিত দুই কারণই মারাত্মক!

টিআইবির অনুসন্ধানকারীগণ প্রশ্ন তৈরি থেকে শুরু করে পরীক্ষাকক্ষে তা বিতরণ পর্যন্ত ৪০টি ধাপের খোঁজ পেয়েছেন। তাদের ধারণায় এই লম্বা পথ ও তা অতিক্রমে যে সময় ব্যয় হয়, প্রশ্ন ফাঁসকারীদের জন্য সেটাই গোল্ডেন অপরচুনিটি। সেজন্য তদের অনুসন্ধানপত্রটি এ দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুরু করার একটা পরামর্শ দিয়েছে। এই ৪০টি ধাপ যে প্রশ্ন ফাঁসের অপরাধ বন্ধের জন্য বহু মূল্যের ৪০টি দুর্ভেদ্য দেয়াল বা নিশ্ছিদ্র বাঁধ হিসেবে খাড়া করা হয়েছে, প্রতিবেদকগণ মনে হয় তা ঠাউরে উঠতে পারেননি। তবে তারা অন্বেষণে ঠিকই এই ধাপগুলোতেই প্রশ্ন ফাঁসের একেকটা বড়বড় ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন। মনে হয় যেন, একেকটা বাঁধেই ৪০টি করে ছিদ্র। যদি প্রশ্ন তৈরি থেকে পরীক্ষার্থীদের কাছে বিতরণ পর্যন্ত ধাপসমূহ একটু সংক্ষিপ্ত হতো, ধরা যাক ২টি ধাপ, তাহলে ৮০টি ছিদ্র বন্ধের ধকল থাকত। এখন তো ১৬০০ ছিদ্র! কার বাপের সাধ্য এসব বন্ধ করে? এই ছিদ্রগুলো আবার একলা গজায়নি, পেছনে আস্ত একেকটা শিক্ষিত-বুদ্ধিওয়ালা মানুষ। একেকটা ধাপের দুর্নীতিবাজরা বাকি ৩৯টি ধাপ বা পর্দার আড়ালে সহজেই লুকিয়ে যায়। দুর্নীতি দমনকারীরা তাদেরকে ধরতে গিয়ে কয়দিন গোলকধাঁধায় গোল্লাছুট খেলে বাড়ি এসে বিশ্রাম নেন। তাদের অপূর্ব ছোটাছুটি দেখে বাইরে থেকে পাবলিকেরও ধাঁধা লেগে যায়।

শিক্ষিত-বুদ্ধিওয়ালা মানুষ না থাকলে প্রশ্নফাঁসের ভূত কবেই মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। দেখা যায়, সর্ষের দানায় দানায় ভূত! ধরা যাক, প্রশ্ন ছাপানোর একটা মাঝ পর্যায়ের কথা। প্রতিবেদনের সারমর্মে বলা হচ্ছে– 'কম্পোজার প্রশ্ন দেখার সুযোগ পান বলে কম্পোজ করার সময় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এছাড়া কম্পোজ হয়ে গেলে সেটির প্রুফ দেখার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকে। ছাপানোর কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে প্রশ্ন মুখস্থ করে প্রশ্ন ফাঁস করার তথ্য পাওয়া যায়। আবার কম্পোজের পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কম্পোজার কর্তৃক সংরক্ষণের সময়ও প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থাকার তথ্য পাওয়া যায়। মুদ্রণকাজ শেষে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত আকার ধারণ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। ... প্রশ্ন গণনা ও প্যাকেট করার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি থেকে যায়। তাছাড়া বিতরণের আগে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।'

নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে বাঙালির মনে অন্যের উপকার করার এমন প্রবল ইচ্ছে জগতে বিরল! আর একে ঘিরে আমাদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা ও সমন্বিত উদ্যোগের যে মহামিলন তা দেখে বিস্মিত হবে না, জগতে এমন নাদান আছে কি? প্রশ্ন ফাঁসের এই পজিটিভ দিকটা টিআইবির গবেষকদের চোখেই পড়েনি, আশ্চর্য! তারা এর সঙ্গে সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতিবাজদের সম্পর্ক খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। তাদের অনুসন্ধানের ফল ফাঁস করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজওয়ালারা তা লুফে নিয়েছেন। ইদানীং সরকারের দোষ ধরাটা যেরকম কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, তাতে এ সুযোগটা কেউ হাতছাড়া করতে চাননি। খবরের কাগজে প্রতিবেদন- মর্মের সার বেরিয়ে গেছে। দেশের প্রতিটি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে এরকম ৪০টির বেশি দেয়াল দিয়ে নির্মিত আর প্রতিটি ব্যবস্থায় যে ১৬০০টির বেশি ছিদ্র তা বহুকাল ধরে আমজনতার জীবনে অশ্রুর কারণ আর তাদের আড্ডায় কৌতুকের খোরাক। টিআইবির অনুসন্ধানকারীগণ একটা ছোট্ট পরিসরে তা হাতেনাতে ধরে দেখালেন। তবে প্রতিবেদনটিতে প্রশ্ন ফাঁসের সমস্যাকে যে রকম ভালো মানুষ-মন্দ মানুষের কাহিনীর মতো উপস্থাপন করতে হয়েছে, সেটি একটা অপরিহার্য সীমাবদ্ধতা।

ভালো মানুষ-মন্দ মানুষ জাতীয় গল্পের বাইরেও প্রশ্ন ফাঁস সমস্যার একটা রাষ্ট্রীয় চেহারা আছে যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতি-পদক্ষেপের মধ্যে সমস্যার বীজ রোপণ ও বেড়ে ওঠা নিহিত। প্রশ্নফাঁসের জ্বর যে রোগের লক্ষণ তা বড় ও জটিল, নিছক প্যারাসিটামলে সারবে না। তাছাড়া পুরনো সমস্যা তো আছেই – প্যারাসিটামল জ্বর সারাবে, প্যারাসিটামল সারাবে কে? ধরা যাক, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ধরা পড়লে শাস্তির পরিমাণ (১৯৯২ সালে) ১০ বছর থেকে কমিয়ে যে ৪ বছর করা হলো প্রতিবেদনটিতে তা পুনর্বহালের সুপারিশ করা হয়েছে। ছোট্ট প্রশ্ন হলো– শাস্তি ১০ গুণ বাড়ালে বা ১০ ভাগ কমালে কি হবে, যদি তার প্রয়োগ না হয়? একটু বড় প্রশ্ন হলো, শাস্তির পরিমাণ কমানো হয়েছিল কোন প্রয়োজনে?

রাখাল রাহা তার 'প্রশ্ন ফাঁস ও শতভাগ পাস : কাঠামোগত, সংগঠনগত ও ব্যবস্থাপনাগত ভিত্তি' শীর্ষক এক দীর্ঘ নিবন্ধে (আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত 'সর্বজনকথা'র যে সংখ্যা) প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে কয়েকটি বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যেনতেনভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার টার্গেট পূরণ করে আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র লাভ, শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করে সত্যিকারের শিক্ষা, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে নেয়া, অন্যদিকে টিলেঢালা পরীক্ষা ও নাম্বার-বন্যার মাধ্যমে পাসের হার বাড়িয়ে প্রাইভেট স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের খোরাক সরবরাহ ইত্যাদি। টিআইবি প্রতিবেদন জানাচ্ছে প্রশ্ন বেচাকেনার মুক্তবাজারের কথা, যেখানে কাউকে খালি হাতে ফেরানো হয় না, একেকটি প্রশ্ন ২০ থেকে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এছাড়া বিনা পয়সায় পরোপকারীও কম নেই। বাঙালি তো পরোপকারীরই দেশ! একসময় দিল্লীশ্বর তারপর ব্রিটিশের উপকার করতে করতে বাঙালি নিজের দিকে তাকানোর সময় পেল কই?

টিআইবি প্রতিবেদনে আমাদের পরোপকারগুণের আর রাখাল রাহার নিবন্ধে আমাদের বাণিজ্য-বুদ্ধির প্রমাণ মেলে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী – তাও শিশুর শিক্ষা নিয়ে! জনাব রাহা স্পষ্ট করে বলেছেন, 'যত বেশি বেসরকারি স্কুল-কলেজ তত বেশি বাণিজ্য; যত বেশি পরীক্ষা, যত বেশী পাশ, তত বেশি বাণিজ্য।' একটা আনুমানিক উদাহরণ দিয়েছেন, 'এবার প্রায় ৩৫ লাখ শিশু প্রাথমিকস্তরের পরীক্ষা দিয়েছে। এদের অধিকাংশই গাইড বই কিনেছে। গড়ে যদি একটা গাইডও সবাই কিনে থাকে আর তার দাম যদি গড়ে ৫০০ টাকা হয় তবে শুধু এই খাত থেকেই বাণিজ্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা। আবার প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থী স্কুলে অথবা স্কুলের বাইরে কোচিং করেছে, করতে বাধ্য হয়েছে। মাসে ৫০০ টাকা হলেও ১০ মাসে প্রতিটি শিক্ষার্থী ৫০০০ টাকা খরচ করেছে। তাহলে কোচিং খাতে বাণিজ্য হয়েছে প্রায় ১৭৫০ কোটি টাকা।' আর এসব আয়ের ভাগ পান স্কুল-কলেজের শিক্ষক, পরিচালনাকারী কমিটি ও শাসন-প্রশাসনের লোকজনসহ অনেকে।

রোগ স্বীকার করলে চিকিৎসার একটা পথ তৈরি হয়, কিন্তু রোগীর অভিভাবকগণ যদি তারস্বরে চিৎকার করতেই থাকেন যে, রোগী বহাল তবিয়তে আছে, কোন সমস্যা নেই, তাতে রোগীর অবস্থা আরও মন্দ ছাড়া কিছু হবে না। আসল প্রশ্ন, রোগীর আসল অভিভাবক কে?